বাংলা থিয়েটারে পেশাদার-অপেশাদারের দ্বান্দ্বিকতা

বিষ্ণু বসু

এক

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর গেরাসিম লিয়েবেদেভ যখন প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গলি থিয়েটার, তখন একই সঙ্গে তিনি অন্তত দুটো ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলা যায়। নতুন গড়ে ওঠা রাজধানী কলকাতা যার শরীর থেকে তখনও গাঁয়ের গন্ধ মেলায়নি, সেখানে তিনি খুলে ফেললেন একটি বিলিতি ধাঁচের থিয়েটার। আজকের কলকাতায় তাঁর উচ্চাশার পরিমাপ করা নিতান্ত সহজ হবে না। শহর কলকাতায় তখন অবশ্য থিয়েটার এসে গেছে, সাহেবপাড়ার দুচারটে খুচরো স্বল্পস্থায়ী থিয়েটার ছাড়াও বেশ জাঁকিয়ে চলছে 'দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার', এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পেছনের রাস্তাটায় ছিল সেই থিয়েটার। ১৭৭৫ থেকে ১৮০৮ পর্যন্ত ছিল স্থায়িত্বকাল। তবে এ ধরনের বা তখনকার অন্যান্য সাহেবি থিয়েটারে বাঙালিদের ঢোকবার অধিকার ছিল না। তাই এ ধরনের থিয়েটার যে কী বস্তু সে সম্পর্কে দেশি মানুষদের বিশেষ ধারণা না থাকারই কথা। কলকাতার অধিবাসী তখনও অভ্যস্ত ছিলেন যাত্রা, ঝুমুর, সং ইত্যাদি প্রদর্শ শিল্পে। তাই এ পরিবেশে লিয়েবেদেভের পক্ষে একটি বিলিতি ধরনের থিয়েটার খুলে ফেলা ঝুঁকির কাজ ছিল বইকি। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বেঙ্গলি থিয়েটারকে গোড়া থেকেই পেশাদারী হিসেবে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। এটাও বড় কম ঝুঁকির কথা ছিল না। কেন না নিতান্ত অপরিচিত একটি প্রদর্শ শিল্পে টিকিট কিনে ঢুকে পড়া খুব সহজ ছিল না নিশ্চয়ই। টিকিটের দামও নেহাত কম ছিল না। গ্যালারি টিকিটের দাম ছিল চার টাকা করে সিট ও বক্সের টিকিটের দাম আট টাকা করে। মনে রাখতে হবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মাত্র সিকি শতাব্দী পরে হলেও তখন মোটামুটি দেশে একটা স্থিতি এসেছে। অন্তত মধ্যবিত্তদের কাছে তো বটেই। অবশ্য উনিশ শতক ব্যাপী যে ধরনের মধ্যবিত্তরা সমাজে প্রভাব ফেলে চলেছিলেন, সে শ্রেণীর উদ্ভব তখন হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটা নতুন জমিদার শ্রেণী তখন সদ্য উঠে আসছে। কেরানি, শিক্ষক, উকিল অথবা ইংরেজি শিক্ষা পাওয়া শ্রেণী তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই কাদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে লিয়েবেদেভের এ হেন ঝুঁকি ছিল তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তখন চালের মণ খুব বেশি হলে দু টাকা থেকে আড়াই টাকা। অন্যান্য জিনিসপত্রও সস্তা। এ হেন পরিস্থিতিতে থিয়েটারের টিকিটের দাম চার টাকা ও আট টাকা এবং এত টাকা খরচ করার মতো মানুষও তখন কলকাতায় কম নয়। তার প্রমাণ ২৭ নভেম্বরের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। লিয়েবেদেভ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন নতুন গড়ে ওঠা কলকাতায় একটা বেঙ্গলি থিয়েটার চলবার মতো বাজার গড়ে উঠেছে। শিল্পদৃষ্টি লিয়েবেদেভের যাই থাক না কেন, ব্যবসাবুদ্ধি বেশ প্রখরই ছিল। একটা অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর নাটক অক্ষম অনুবাদে মঞ্চস্থ করার মতো মনের জোর তাঁর ছিল। অবশ্য বাঙালি দর্শকের রুচি সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটেই ভালো ছিল না। তাই নাটকের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করেছিলেন নানা ভাঁড়ামি এবং বিদ্যাসুন্দরের গান। বিদ্যাসুন্দরের অবৈধ শরীরভিত্তিক প্রেমের বাজারও নিতান্ত খারাপ ছিল না তখন।

তবু বেশিদিন চলেনি 'বেঙ্গলি থিয়েটার'। কতটা নিজের দলের দুর্বলতায়, আর কতটাই বা ইংরেজদের বিরোধিতায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আপাতত সে বিতর্ক থাক। আমাদের শুধু এটুকুই লক্ষ্য করার বিষয়, নতুন শহর কলকাতায় বাংলা নাটক নিয়ে একটি রঙ্গমঞ্চ পেশাদারিভাবে চালানো সম্ভব, এ ধারণা বা প্রত্যয় লিয়েবেদেভ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু লিয়েবেদেভের এ প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্নই থেকে গেল, কোনও উত্তরসুরি তৈরি করল না। বাংলা মঞ্চ চালাতে দীর্ঘকাল আর এগিয়ে এলেন না কোনও বিদেশী, এমনকি কোনও বাঙালিও। সেজন্য অপেক্ষা করতে হল আরও ৩৫-৩৬

বছর। ১৮৩১খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর শুঁড়ার বাগানবাড়িতে বসালেনথিয়েটারের আসর। শু হল বাবুদের বাড়ির থিয়েটার।

দুই

এ সময়সীমার মধ্যে কিন্তুসাহেবপাড়ার থিয়েটার চলছিল বেশ জাঁকিয়েই। ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধহয়ে গেলেও এল 'চৌরঙ্গি থিয়েটার' যার সঙ্গে ত্রিশের দশকে জড়িতহয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এমনকি শহরের উপান্তে দমদম এলাকায় দেখা দিয়েছিল 'দমদম থিয়েটার' ১৮১৪ সালে। তবু বাঙালিরা তখনও বাংলাথিয়েটার নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তারও অবশ্য কারণ ছিল। তখনবাংলা নাটক লেখা হয়নি। বাংলা গদ্যই তখন প্রায় অজানা। ফোর্ট উইলিয়মকলেজে বাংলা গদ্য নির্মিত হতে শু করেছে কিন্তু সমাজের সঙ্গে দুরত্ব তার অনেক।রামমোহন এলেন ১৮১৫ নাগাদ গদ্য রচনায়, কিন্তু নাটককারেরা হাতে এবংঅমিত্রাক্ষর ছন্দও সৃষ্টি হল পাঁচের দশকেই। তাই ছাড়া নাটক তোএকক শিল্পকর্ম নয়; তার জন্য দর্শকদের চাই সহযোগিতা। তেমন দর্শকসমাজও তৈরি হতে খানিক সময় লাগে বই কী।

তবু তার মধ্যেও ১৮৩১-এপ্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার ও ১৮৩৫ -এ শ্যামবাজারের নবীন বসুরথিয়েটারে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হল। শু হল কলকাতার বাবু থিয়েটার। এদুটো থিয়েটারেই বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল।প্রসন্নকুমারের বাড়িতে যে থিয়েটার হল তা কিন্তু বাংলায় হল না, হলইংরেজিতে। শেকস্‌পিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবংভবভূতির উত্তরচরিত নাটকের কিছু কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করে।কৌতুহলের ব্যাপার হল যে কলকাতায় প্রথম বাংলা থিয়েটার করলেনএকজন বিদেশী এবং একজন বাঙালি প্রথম থিয়েটার করলেন বিদেশী ভাষায়।এটা বোধ হয় কলকাতার বৈপরীত্যেরই একটা চেহেরা।
সে যাই হোক, ১৮৩১ থেকে১৮৭৩ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় তেতাল্লিশ বছর ধরে বাঙালি বাবুদেরবাড়িতে থিয়েটার মোটামুটি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষতপাঁচ ও ছয়ের দশকে। অবশ্য প্রথম পঁচিশ বছরে বাংলা নাটকের সংখ্যা ছিলমাত্র দুটি। প্রযোজনার সংখ্যাও তখন তেমন বেশি ছিল না। তবু তার মধ্যেও খরচের যেন কোনও সীমা মানতেন না উদ্যোক্তরা। এসব প্রযোজনায় দর্শনীর বিনিময়েনাটক দেখার সুযোগ ছিল না, টিকিট বিক্রির কোনও ব্যবস্থাই ছিল না।সম্পূর্ণ নিজেদের খরচ, বোধহয় ধনীত্বের অঙ্গ হিসেবেই নাট্য প্রযোজনা ও এসবঅভিনয়ের বন্দোবস্ত হত। নবীন বসু তাঁর বিদ্যাসুন্দর নাটকের একটিঅভিনয়ের জন্য কয়েক লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। এমনকি ইংরেজিটোলারএকটি বাড়িও নাকি তিনি ও জন্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ঘোষশকুন্তলা-কে সাজাতে লাখ টাকার অলংকার জোগান দিয়েছিলেন। বেলগাছিয়াথিয়েটারে প্রতিটি মহলার দিনই খরচ হত প্রচুর। তা ছাড়াঅভিনয়ের দিন তো কোনও কথাই ছিল না। বই ছাপানো থেকে শু করে অতিথিআপ্যায়ন, বিশেষ করে সাহেব-মেমদের জন্যে খরচ করা হত অপর্যাপ্ত। তবুঅনিয়মিত অভিনয় ও সুপ্রচুর বিলাসিতার মধ্য দিয়েও নির্মিত হতে চলছিল বাংলা থিয়েটার। এসেছিলেনরামনারায়ণ তর্করত্ন ও মধুসূদন দত্তের মতো নাটকারেরা। নাট্যসাহিত্যেরউন্নতির জন্যে তৈরি হয়েছিল ব্যাপক আগ্রহ, অপেশাদার পরিবেশের মধ্যদিয়েই। ষাটের দশকের মধ্যভাগে 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' এঐতিহ্যে যুক্ত করল নতুন মাত্রা, কেননা প্রায় এক দশক পরে এ বাড়িরথিয়েটারেই আবির্ভুত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিন

কিন্তু বাবুদের বাড়িরথিয়েটার খানিক আড়ালে চলে গেল মধ্যভাগ থেকেই। শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলেরকিছু মধ্যবিত্ত তণ শু করলেন নতুন ধরনের নিয়মিত থিয়েটার। তাঁদের অবলম্বনহলেন নতুন নাটককার দীনবন্ধু মিত্র। অল্প খরচে জাঁকজমক ছাড়া নাট্যপ্রযোজনায় আগ্রহী হলেন তাঁরা। চাঁদা তুলে মঞ্চস্থ করলেন'লীলাবতী', 'সধবার একাদশী'। তাঁদের

ছিমছামপ্রয়োজনা ও মনস্ক অভিনয়ে সাড়া পড়ে গেল সারা কলকাতায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, ধর্মদাস সূর প্রমুখ শিল্পীদের নামছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন বুধজনেরা। অপেশাদারবাংলা থিয়েট ারের নতুন একটা চেহারা দেখা গেল।

কিন্তু তাঁদের সাধ থাকলেওসামর্থ্য ছিল না বেশি। তাই প্রয়োজনার খরচ মেটাতে তাঁরা প্রচণ্ডঅসুবিধেয় পড়লেন। এমনকি যাঁরা নিয়মিত অর্থসাহায্য করবেন বলেপ্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাত গুটিয়ে নিলেন অনেকেই।অতঃপর সত্তর দশকের গোড়ায় স্থির হল টিকিট বিত্রি করে অভিনয়করবেন তাঁরা। প্রবল আপত্তি এল নিজেদের মধ্যেই কারও কারও ক াছ থেকে,বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে। কিন্তু প্রবল আগ্রহ ছিল অর্দেন্দুশেখরএবং অন্য কয়েকজনের। অবশ্য জীবিকার জন্যে অর্দেন্দপশেখরের রোজগারেরওদরকার ছিল এবং থিয়েটার ছাড়া অন্য কোনও রোজগারের পদ্ধতি তঁ ার পছন্দওছিল না। তাই ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ‘ন্যাশনালথিয়েটার’। সূত্রপাত হল বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের। দর্শনীর বিনিময়ে নাটকদেখার বন্দোবস্ত হল।
অবশ্য দর্শনীর বিনিময়ে নাটকদেখার ব্যবস্থা বাংলায় এই প্রথমই হল না। লিয়েবেদেভের ‘বেঙ্গলিথিয়েটারে’র কথা তো অ ামরা আগেই জেনেছি। শোনা যায় ঢাকা শহরেরদর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার সুযোগ দর্শকরা পেয়েছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারপ্রতিষ্ঠার আগেই। তবু ন্যাশনাল থিয়েটার দিয়েই সাধারণরঙ্গালয়ের যাত্রা শু হয়েছিল বলে ধরা হয় সম্ভবত এ কারণে যে (এক)বাংলা নাট্যাভিনয় এর পর থেকে নিয়মিত হয়ে দাঁড়াল, (দুই) বাংলাথিয়েটার ত্রমে একটা ব্যবসায়িক বন্দোবস্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল।

নাট্য প্রযোজনানিয়মিত হবার দন অভিনয়ের সঙ্গে জীবিকার সূত্রে যুত্ত হলেন বেশ কিছু অভিনেতাও অভিনেত্রী এবং রঙ্গ মঞ্চের নেপথ্যে আরও বহু মানুষ। এ সূত্র ধরেই এ ব্যবসায়েলগ্নি হতে লাগল প্রচুর অর্থ। নেশা ও পেশাকে মেলানোর চেষ্টাহল। অবশ্য সত্তরের দশকেই নাট্যশিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারটা আসেনি। এটাএসেছে আশির দশকে, যখন গুরমুখ রায়, প্রতাপ জহুরি ও অন্যান্যরানাট্য প্রযোজনায় জড়িয়ে পড়লেন। তৈরি হল থিয়েটারে স্টারসিস্টেম। টাকার খেলায় একদল থেকে অন্য দলে ভাঙিয়ে আনা হতে লাগল নামীঅভিনেতা অভিনেত্রীদের। এমনকি নাটককারদেরও। অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গেপ্রতিষ্ঠিত হলে লাগল নানা থিয়েটার। তাদের মধ্যে সবগুলো যেদীর্ঘায়ু ছিল তাও নয়।

তবু থিয়েটারের এ সবপ্রতিযোগীতার ফলেই লেখা হতে লাগল নতুন নতুন অজস্র নাটক। সেকালেএকটি নাটক বহু রজনী চলার রেওয়াজ ছিল না। দর্শকদের চটজলদি খুশি করারজন্যে বিস্তর বাজে নাটকও লেখা হল। তার ফলেই হয়ত প্রচুর ন াটকআমরা পেলাম, কিন্তু নাট্য সাহিত্য তেমন গড়ে উঠল না। ইতিহাসের পরিহাস বোধহয় এটাই যে সেকালের সাড়া জাগানো বেশির ভাগ নাটকই এখন আর আমাদের মধ্যে বিশেষ স্পন্দন তোলে না।থিয়েটারের এ ধারা রাজত্ব করে গেল গিরিশ যুগ থেকে শিশির যুগ পর্যন্ত।নাট্য আন্দোলনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করল পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রায় পচাঁত্তরবছর ধরে।

চার

বাংলা থিয়েটার মূলতমধ্যবিত্তের থিয়েটার। তাই মধ্যবিত্ত মানসিকতা পুষ্ট করার জন্যেইব্যস্ত ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলো এবং তাদের অবলম্বন করে লেখা নাটকসমূহ।তখনকার সময়ে কলকাতার কত পার্সেন্ট মানুষ নাটক দেখতে যেতেন তা জ ানাযায় না। কিন্তু থিয়েটারে টিকিটের দাম যা ছিল তাতে গিরিশচন্দ্রের দাবিঅনুযায়ী ‘আপামর সাধারণ’ যে যেতেন তা অবশ্যই নয়। ১৮৭২খ্রিষ্টাব্দে শুর সময়ে ‘ন্যাশনাল থিয়েটারে’ টিকিটের দাম ছিলআট আনা, এক টাকা ও দু টাকা। পরে দাম আরও রাড়ে। ১৮৭৩ খিষ্টাব্দেগ্র্যান্ড অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে হিন্দু ন্যাশনাল যে অভিনয়ের আয়োজন করেছিল সেখানে টিকিটের দাম আরও বেশি ছিল। অবশ্য সেটি একটি চ্যারিটি শো ছিল।প্রেক্ষাগৃহে ভিড় বেশি হলে চার টাকার টিকিট আট টাকাতেওবিত্রি হল এমন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে ভারতবাসীর মাথাপিছু দৈনিক আয়

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে দু আনা থেকে কমে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেদেড় আনায় দাঁড়িয়েছিল। এ সময়ে ব্রিটিশ ভারতের সমৃদ্ধতম প্রদেশবঙ্গদেশের অধিবাসীদের বার্ষিক আয় মাথাপিছু ছিল পনেরো টাকা তিন আনা।তাই অত দামে টিকিট কিনে নাটক দেখা সমাজের মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানদেরপক্ষেই সম্ভব হত। প্রসঙ্গত কলকাতার তখনকার জনবিন্যাসের খানিকছবিও এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯01 খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকেজানা যায় যে কলুটোলা অঞ্চলে মোট শিল্পজীবী ছিলেন ২৫,০৫২ জন অর্থাৎজনসংখ্যার শতকরা ৩৯.৭, বাণিজ্যজীবী ৬,১৩৬ অর্থাৎ জনসংখ্যার ৯.৭ এবং উকিলডাক্তার প্রভৃতি জীবিকার মানুষ ৩,০৩৫ অর্থাৎ জনসংখ্যার গরিষ্ঠঅংশের মাসিক আয় ছিল পাঁচ টাকা থেকে পনেরো টাকার মধ্যে। সকলেরপরিবারের সদস্য সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেইএ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালায় দর্শক হিসেবে হাজির থাকা সম্ভবহত কিনা সন্দেহ। চাকরীজীবীদের দিকেও তাকানো যাক। সরকারি চাকরীতেবাঙালি হিন্দুদেরই আধিপত্য ছিল যদিও এ আধিপত্য নিচু স্তরেই বেশি।নিচু স্তরে বাঙালি হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৯০ জন এবং তাঁদের বেতন গড়ে২৫-৩০ টাকা থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। দশ থেকে কুড়ি টাকা বেতনের কর্মচারীএমনকি দুশো থেকে পাঁচশ টাকা বেতনের বাঙালি কর্মচারীও ছিলেন, তবেতাঁদের সংখ্যা ছিল সামান্য। সমাজ-তাত্ত্বিকের ভাষায়, "মধ্যবিত্ত বাঙালিহিন্দু নাগরিক কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত এ নিম্নস্তরের চাকরিসম্বল করে।" তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবারপ্রতিপালন করে শতকরা কত জন মধ্যবিত্ত নাট্যগৃহে হাজির হতে পারতেনতা বলা কঠিন। সেকালে দর্শকসংখ্যা সীমিত ছিল অথচ প্রেক্ষাগৃহে বাদুড়ঝুললে দৈনিক টিকিট বিত্রি আঠারশো টাকা, এমনকি তার চাইতেও বেশিহত। তাই এ কথা অনুমান করলে বোধহয় ভুল হবে না যে কলকাতার থিয়েটারেনিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত যাঁরা থাকতেন তাঁদের সিংহভাগ ছিলেনবড় মাপের কেরানি, উকিল, ডাক্তার এবং জমির উপস্বত্বভোগী নতুন জমিদারশ্রেণী। বাংলা থিয়েটার ও নাটকের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল এঁদেরইচি, মেজাজ ও চাহিদা প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে।

এ শ্রেণীর মানুষদেরচাহিদার চেহারাটি কোন ধরনের ছিল? মনে রাখতে হবে উনিশ শতকী নবজাগরণএই শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বাঙালিরই সৃষ্টি। আমাদের নবজাগরণ প্রধানত মাথাঘামিয়েছে সমাজ-সংস্কার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশেষ করে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবংশিক্ষাবিস্তার ও ধর্ম আন্দোলন নিয়ে। সমাজ সংস্কারের মূলেও ছিল নারীকেন্দ্রিকভাবনা। দেশপ্রেমের বাসনাও এর অঙ্গীভূতযদিও স্বাধীনতালাভেরআকাঙ্ক্ষা তেমন ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারও নারীকেন্দ্রিকছিল। বাংলা থিয়েটারকে বাঙালির এ মনস্তত্ত্ব প্রভাবিত করেছিল।তাছাড়া হিন্দুমেলা থেকে শু করে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধানাও থিয়েটারেসাঙ্গীকৃত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ও মনস্তত্ত্বকে রূপ দিলেন নাটকে। তাঁরহাতে বাংলা নাটক নির্দিষ্ট চেহারা পেল। গিরিশচন্দ্র ও অনুগামীদের লেখায়বাংলা নাটকের যে শ্রেণীবিন্যাস হল তাকে বোধহয় সাজানো চলে এভাবে--(এক) পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে ভক্তিরস, (দুই)ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে দেশপ্রেম তথা ঐতিহাসিক নাটক, (তিন)পারিবারিক কিছু সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটক, (চার) মূলত আরব্যরজনীর গল্প নিয়ে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং (পাঁচ) প্রহসনও পঞ্চরং। গিরিশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত চলেছে মোটামুটি এধারারই অনুবর্তন। পেশাদারি মঞ্চের এ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছেআমাদের মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ, ভাষা পেয়েছে সীমিত প্রতিরোধ,আন্দোলিত হয়েছে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের সবলতা ও দূর্বলতা।প্রায় পচাঁত্তর বছর ধরে পেশাদারি মঞ্চের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিতহয়েছে আমাদের নাট্যভাবনা, এমনকি আমাদের রাজনৈতিক চেতনাও।

পাঁচ

কিন্তু এ পেশাদার রঙ্গালয়েরসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান ছিল বিপুল। নাটকের বিষয় ও প্রয়োগে তাঁরথিয়েটার ছিল বিপরীত প্রান্তবাসী। প্রায় ষাট বছর সত্রিয়নাট্যচর্চা করলেও পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে তাঁর সংলগ্নতা গড়ে ওঠেনি।গিরিশ যুগের কথা তো ছেড়েই দিলাম, এমনকি শিশিরকুমার প্রযোজিততথাকথিত সেরা নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের চিকে পীড়িত

করেছিল তারঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। 'সীতা' বা 'রীতিমত নাটক'নিয়ে তাঁর বিতৃষ্ণার কথা সকলেরই জানা। আবার, রবীন্দ্র নাটককেওসাধারণ মঞ্চের দর্শকরা তেমন পছন্দ করেননি, এ কথাও সত্য। 'চিরকুমারসভা' বা 'শেষরক্ষা' সাধারণ মঞ্চে কিছুটা সফল হয়েছিলসন্দেহ নেই, কিন্তু 'তপতী', 'গৃহপ্রবেশ' এমনকি'যোগাযোগ'ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাট্যের সেরাফসল 'ডাকঘর', 'রাজা', 'রক্তকররী' অথবা'মুক্তধারা' পেশাদার মঞ্চে প্রযোজনা করার দুঃসাহস স্বয়ংশিশিরকুমারও দেখাতে পারেননি। অথচ রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠতেপারত বাঙালির যথার্থ নাট্য আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের থিয়েটারেই ছিল আমাদেরপ্যারালাল থিয়েটার।

তাই রবীন্দ্রনাটক বারবীন্দ্রনাথের থিয়েটারকে তাঁর সমকালীন পেশাদার মঞ্চের প্রেক্ষিতেরেখে দেখা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মার্কসিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনিসভ্যতার শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণভাবে ঢুকে যেতে পেরেছিলেন এবংতাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপযোগী ক্রিয়াশীল কাব্যময় নাট্যভাষা সৃষ্টিতেসক্ষম হয়েছিলেন যা সেকালের গিরিশ-শিশির অধ্যুষিত বাংলা থিয়েটারেরদর্শকদের কাছে ছিল অপরিচিত। কিন্তু যুদ্ধ মন্বন্তর দেশভাগসাম্প্রদায়িকতা থেকে শু করে স্বাধীনতা-উত্তরকালের আর্থিক-সামাজিক ওনৈতিক সংকট এ প্রজন্মের মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাটকের সমীপে নিয়েযেতে সাহায্য করেছে প্রবলভাবে। তার অভিঘাত রাজনৈতিক শিল্পচেতনারস্তরে যে তরঙ্গ তুলেছে তাকে স্বীকরণ করেই গড়ে উঠেছে আমাদেরএকালের থিয়েটার। তাই মনে রাখতে হবে আমাদের গ্রুপ থিয়েটারেরমানুষেরা শুধু অভ্যাসের বশেই রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন না। এউচচারণের মধ্যে থাকে ঐতিহ্যের শেকড়ে আত্মানুসন্ধানের তাড়না।

ছয়

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দেভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৪-এ 'নবান্ন'। বাংলাথিয়েটারের মূল স্রোত আবার ফিরে এল অপেশাদার নাট্যকর্মীদের হাতে।প্রথম পর্বে গণনাট্য সংঘ বেশিদিন টিকে না থাকলেও বাংলা থিয়েটারেরচেহারা পালটে দিয়ে গেল। তাই গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার এক দশকেরমধ্যেই পেশাদার মঞ্চ থেকে শিশিরকুমারের কণ বিদায় কতগুলো সত্যকেওপ্রতিষ্ঠা করে গেল। বাংলা থিয়েটার আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল।এটা যে শুধু বিদেশী নাটকের প্রতি পক্ষপাতের দন সংঘটিত হল তানয়। চিন্তা ও চেতনায় তা আন্তর্জাতিক ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হল।তার মূল চালিকাশক্তি হল মার্কসবাদ। তাই এ সময়ে পুরনো পৌরাণিক,ঐতিহাসিক প্রভৃতির অনুবর্তন আর চলল না। পেশাদার মঞ্চ টিকে থাকতেচাইল নানা ধরনের ভাবাবেগ-ভরা নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে, ঘুরে বেড়াতেলাগল প্রহসনের অলিতে-গলিতে এবং অর্ধনগ্ন নারীদেহের প্রদর্শনীতে।পরিস্থিতি এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যে পেশাদার মঞ্চে কোন নাটক অভিনীতহচ্ছে তার খবর থিয়েটার প্রেমিক আর রাখেন না। একটা সময় এসেছিল যখনফিল্মের নায়কদের স্টার-ভ্যালু ভাঙিয়ে বাংলা ফিল্মের সঙ্গেযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্টার-ভ্যালু আর তেমন নেই। তাই তাঁদেরনিয়ে বোধহয় দর্শকরা আর মাথাও ঘামান না। বিরল ব্যতিক্রম সৌমিত্রচট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছ থেকে পেশাদার মঞ্চে কিছু ভালো প্রযোজনাপাওয়া গেছে। 'নামজীবন', 'ফে রা', এমনকি'নীলকণ্ঠ'-ও কিন্তু তাঁকেও শেষ অব্দি 'ঘটকবিদায়' বা'চন্দনপুরের চোর' করতে হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে পেশাদার মঞ্চথেকে কোনও ভালো নাটককার উঠে আসেন নি।

তাই চল্লিশের দশক থেকেইবাংলা থিয়েটারের মূল ধারা আবার পেশাদারদের হাত থেকে অপেশাদারমানুষদের হাতে এসে পৌঁছল। প্রথমে গণনাট্য ---মধ্য চল্লিশে, তারপরগ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষদের হাতে। চল্লিশের দশকে অবশ্য গণনাট্যবেশিদিন টিকে থাকেনি। তাঁদের প্রথম সফল প্রযোজনাই ঘটনাচক্রেশেষ ভালো প্রযোজনা হয়ে দাঁড়ায়। গণনাট্য তখন কেন ভেঙেছিল তা নিয়েবিতর্ক আছে। আপাতত সে প্রসঙ্গ তোলা থাকছে। কিন্তু ১৯৪৮-এর পর থেকেবহু গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম হল। এল বহুরূপী, পি এল টি, শৌভনিক, সুন্দরম,নান্দীকার এবং আরও অনেক। পঞ্চাশ দশকের গণনাট্য পুনর্জীবিত হল,প্রতিষ্ঠিত হল তার নানা শাখা, পাওয়া গেল প্রচুর ভালপ্রযোজনা---বিশে জুন, রাহুমুক্ত প্রভৃতি। গণনাট্যের বিভিন্ন শাখা ওগ্রুপ থিয়েটারগুলি মিলে বাংলা থিয়েটার একটা গৌরবের জায়গায় চলেএল। নানা ওঠাপড়

ার মধ্য দিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা থিয়েটারপ্রবাহিত হয়ে চলেছে। এসেছেন বড় মাপের সব পরিচালক --- শম্ভু মিত্র,উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদভট্টাচার্য, হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং হাল আমলে তণদের মধ্যেরমাপ্রসাদ বনিক, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুমনমুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বেশ সাড়া জাগিয়ে এসেছেন কিছু মহিলা পরিচালক ---শাঁওলী মিত্র, সোহাগ সেন, জয়তী বসু, সীমা মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। বহু বড়মাপের অভিনেতা-অভিনেত্রী আমরা পেয়েছি। গ্রুপ থিয়েটারে যাঁদের মধ্যেআছেন বিজন ভট্টাচ ার্য, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র,শোভা সেন, অনুসুয়া মজুমদার, অসিত মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, অজিতেশবন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, মায়া ঘোষ এবং আরও অনেক সমর্থ শিল্পী।গ্রুপ থিয়েটারকে অবলম্বন করে দেখা দিয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদলসরকার, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেন, দেবাশিস মজুমদার, ইন্দ্রাশিসলাহিড়ী প্রমুখ নাটকারেরা। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কারকরেছে এ প্রজন্ম বহুরূপীর ম াধ্যমে। বাংলা মঞ্চে হাজির হয়েছেন ইবসেন,চেকভ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট এবং আরও কিছু বলিষ্ঠ বিদেশি নাটককার।তার ভালমন্দ মিশিয়ে বাংলা থিয়েটার এখন প্রবল একটা ইতিবাচক জায়গায়রয়েছে। তারই প্রেরণায় এখন প্রকাশিত হতে প ারছে বেশ কিছুনাট্যপত্রিকা। তাদের মধ্যে গণনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার নিয়মিত এবং বহুরূপী,গন্ধর্ব, স্যাস, শুদ্রক প্রভৃতি পত্রিকা বছরে একটি কী দুটি সংখ্যা করে।মফস্বল থেকেও নিয়মিত বেচেছ আননায়ুধ, শিল্পায়ন ও আরও কিছু পত্রিক া।থিয়েটার নিয়ে একটা স্বাস্থ্যকর আলোড়ন না হলে এ কাজগুলো সম্ভব হতনা। নাট্য একাডেমির কথাও এ প্রসঙ্গে বলা য ায়।

সাত

কিন্তু এত সব অস্তি-রমধ্যেও দেখা দিচ্ছে কিছু কুঞ্চন। গ্রুপ থিয়েটার বরাবরই বেঁচে আছে কিছুমানুষের অসামান্য অ াত্মনিবেদনে। প্রযোজনার খরচ চিরকাল বহন করে এসেছেনতাঁরা। উৎপল দত্ত অথবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন কিছু পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তের জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও সরেদাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন কয়েক বছর প্রয়াসের পর।

পেশাদার মঞ্চে অর্থলগ্নির প্রসঙ্গ তুলে এখানে যায় নাকিছুতেই। এখানে একটি স্বীকৃত বড় নাট্যদল এবং একটি অবর ন াট্যদলেরঅর্থনৈতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় আনা হচ্ছে। অসিত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেজানা গেছে ‘তখন বিকেল’ ন াটকটি প্রযোজনার জন্য প্রাথমিকখরচ পড়েছিল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। তার মধ্যে মঞ্চসজ্জা, আলো ওসংগীতও রয়েছে। তারপর প্রতিটি শোয়ের জন্য খরচ পড়েছে কমবেশিসাড়ে চার হাজার টাকা করে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন খরচও নিত ান্ত কমনয়। প্রতিটি শোয়ের থেকে তাঁদের অর্থ আদায় হয়ে থাকে সাড়ে পাঁচথেকে ছ হাজার টাকার মধ্যে যদি প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকে। অবশ্য এ হিসেব‘হল’ শোয়ের জন্য ধরা হয়েছে। কল শোয়ে ক্ষেত্রেবিশেষে পাঁচহাজার থেকে দশ হাজার টাক া পাওয়া যায়। যেহেতু ‘তখন বিকেল’প্রযোজনাটি প্রচুর কল শো পেয়েছে তাই তাঁদের আর্থিকঅবস্থা বেশ ভালই।

কিন্তু এমন অবস্থা আরকটি নাট্যদলের? খুব বেশি হলে দশটির। অথচ কলকাতা ও মফঃস্বলে রয়েছেঅন্তত কয়েক হাজার নাট্যদল। কেম্ব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়ার সাম্প্রতিকসংস্করণে কলকাতার নিবন্ধীকৃত নাট্যদলের সংখ্যা যা বলা হয়েছে তা হয়তঅনেকটাই বাড়ানো, কিন্তু নাট্যদলের সংখ্যা নিতান্ত কমও হবে না। এসব দলকীভাবে করে চলেছে নাট্য প্রযোজনা?

একটা ছোট্ট দলের সাম্প্রতিকপ্রযোজনার কথাই ধরা যাক। প্রযোজনার প্রাথমিক খরচপড়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। এর মধ্যে মঞ্চ, আলো, সংগীত ওআনুষঙ্গিক খরচ আছে। প্রতিটি শোয়ের জন্য তাদের খরচ পড়ে কমবেশিচার হাজার ট াকা। হল-ভেদে খরচ খানিক ওঠানামা করে। প্রসঙ্গতকলকাতার নামী থিয়েটার হলগুলোর ভাড়ার কথাও বলা যায়। ভ াড়াযথাক্রমে ১৯৯৫ সালে ছিল, একাডেমি অব ফাইন আর্টস--- ১৮৫০ টাকা, শিশির মঞ্চ--- ৪০০ টাকা, গিরিশ মঞ্চ -

-- ৮০০ টাকা এবং জ্ঞান মঞ্চ --- ১৫০০ থেকে ১৭০০টাকা। এখন তা আরও বেড়েছে। অন্য হলগুলোর কথা না হয় বাদই রইলআপাতত। এসব হলের মধ্যে আবার একাডেমিতে যে ধরনের সাড়া পাওয়া যায়,অন্যত্র তা মেলে না। প্রতিদিনের প্রয়োজনার খরচ হল ভাড়াসহ যা পড়েতার সঙ্গে আবার যুক্ত হয় বিজ্ঞাপনের খরচ। তার পরিমাণও সামান্য নয়, খুব কমকরেও প্রায় ১২০০ টাকা। অথচ এ দলের গড় টিকিট বিক্রির আদায়একাডেমিতে হলে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। তাও খুব বেশি হলে। গিরিশেদেড় হাজার টাকা হলে বেশ বেশি। স্বভাবতই এ নাট্যদলের দেনা প্রচুর,প্রায় ষাট হাজার টাকা। সদস্যদের মধ্যে বেশিরভাগই বেকার। যাঁরাজীবিকার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের পকেট থেকে পয়সা তাই বেশি যাবেই। এটাইকিন্তু বেশিরভাগ নাট্যদলের সাধারণ চেহারা। সদস্যরা থিয়েটার থেকেরোজগার তো করেনই না, বরং সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে থিয়েটারকে জীবন্তরেখেছেন তাঁরা। খুব সামান্য সংখ্যক মহিলা শিল্পী কোনও কোনও দল থেকেকিছু সম্মানমূল্য পেয়ে থাকেন।

অবশ্য কোনও কোনও নাট্যদলকখনও কখনও পেয়ে যায় কিছু সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা। স্পনসরশিপেরপ্রচলন বেশ বেড়েছে। এগিয়ে আসছেন বেশ কিছু সংস্থা। তাছাড়া রয়েছেপশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি। তাঁরাও বিগত কয়েক বছর ধরে অনুদান দিচ্ছে বিবিধনাট্যদলকে --- কলকাতার ও মফস্বলের। তার পরিমাণ প্রতি আর্থিকবছরে প্রায় তিন লাখ টাকা। কিন্তু এতগুলো দল যেখানে অনুদানের হারশেষ পর্যন্ত এমন বেশি কিছু দাঁড়ায় না। তবু তো এত অসুবিধের মধ্যেওগ্রুপ থিয়েটার বেঁচে আছে, তার প্রবাহমানতা বজায় রয়েছে। বেঁচেআছে বহু মানুষের অপরিসীম স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে। অবশ্য কোনও কোনও মহলথেকে বলা হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা নাকি গ্রুপ থিয়েটারকে স্টেপিংস্টোন হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। থিয়েটার তঁাদের প্রথমপ্রেম নয়, তাঁদের নজর থাকে দুরদর্শনের দিকে। কিন্তু এ কথা সঠিক নয়।কেউ কেউ যে এমন থেকেই থাকে, সেটাও তো অন্যায় নয়। এখনকার ভয়াবহবেকারির সময়ে কেউ রোজগার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, তা তো হতে পারেনা। সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরগুলোর দরজাগুলো যখন প্রায় বন্ধহয়ে আছে, সেখানে এ জীবিকার দিকে নজর যাবে না কেন? কিন্তু পরিসংখ্যান নিলেদেখা যাবে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা সামান্যই যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার ছেড়েদূরদর্শনে গেছেন। আসলে আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের সদস্যরা বিগত প্রায়অর্ধ শতক ধরে অপেশাদার হিসেবেই নাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে আছেন। নেশাইহোক, অথবা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই হোক, এ শিল্পশক্তিই উপরনির্ভর করেই প্রবলভাবে জীবন্ত আছে আমাদের নাট্যজগৎ।

বিষ্ণু বসুর জন্ম অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর কলকাতায় আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি.এইচ. ডি.। কলকাতা মহাকরণ, বিভিন্নবিদ্যালয় ও কলেজে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগে অধ্যাপনাও করেছেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। পিতৃসূত্রে নাটক ও থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ। কিছুকাল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি শাখারসক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাটক ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পের নানা বিভাগে তাঁর আকর্ষণ। নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধের বই ছাড়াও কিছুপূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক লিখেছেন। বহুগুরুত্বপূর্ণ বই সম্পাদনা করেছেন। একাধিক বিদেশি নাটকরে ভাষান্তর করেছেন। এখনও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত প্রবন্ধের বই - বাংলানাট্যরীতি, বাবু থিয়েটার, রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার, রাজনীতি নাটকে রাজনীতিথিয়েটারে, ধনঞ্জয় বিরচিত দশরূপক (অনুবাদ ও টীকা) প্রভৃতি;রম্যরচনা - থিয়েটারের গালগল্প, ইতিহাসের কলকাতায়; নাটক - মান্যবরভুল করছেন, থিয়েটারের মেয়ে ও অন্যান্য একাংক। এই প্রবন্ধটি গণমন প্রকাশনা দ্বারা প্রকাশিত তাঁর ‘থিয়েটারভাবনা’ গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে।